

কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে টিকাদান
সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের দৃষ্টিভঙ্গি

বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষেরা মনে করেন লার্নিং সেন্টারগুলো বন্ধ হওয়ার কারণে শিশুদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এটি নিয়ে তারা উদ্বেগ

সূত্র: এ বছর অর্থাৎ ২০২০ এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ক্যাম্প ১ ই, ১ ডব্লিউ, ২ ই, ২ ডব্লিউ, ৩, ৪, ৪ এক্সটেনশন, ৫, ৬, ৭, ৮ ই, ৮ ডব্লিউ, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, কুতুপালং রিফিউজি ক্যাম্প থেকে কেয়ার বাংলাদেশ, ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি), সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল এবং ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস - দ্য ইউএন রিফিউজি এজেন্সি (ইউএনএইচসিআর) কমিউনিটির এই মতামতগুলো সংগ্রহ করেছে (বেস-২০০৬২: পুরুষ - ৬৪%, নারী - ৩৬%)। এছাড়া শিশুদের শিক্ষা ও বিনোদন সম্পর্কিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগগুলো সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গত ২৫ এবং ২৭ অক্টোবর ২০২০, টেলিফোনে ১৫ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচ জন নারী (২৭-৪৩ বছর বয়সী), পাঁচ জন পুরুষ (৩২-৪৪ বছর বয়সী) এবং পাঁচ জন শিশু, যারা ক্যাম্প ২০ এর টেম্পরারি লার্নিং সেন্টার বা শিশু বান্ধব কেন্দ্রগুলোতে (টিএলসি/সিএফএস) যাওয়া আসা করে।

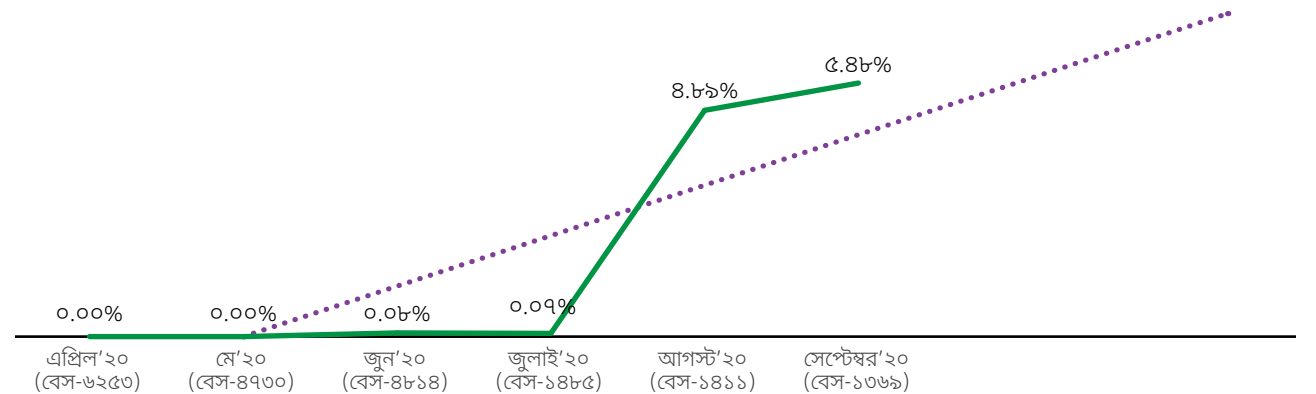
যা জুনা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার
ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৪৭ × বুধবার, ২ ডিসেম্বর ২০২০

কোভিড ১৯ মহামারীর মাঝে গত আট মাসে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা মূলত তাদের জীবনযাত্রার পরিস্থিতি এবং খাবার, আশ্রয় ও খাবারের পাশাপাশি অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী কতটা সহজে পাওয়া যাবে এ নিয়ে বেশি উদ্বেগ ছিলেন। তবে, ২০২০ এর আগস্ট থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে শিশু সন্তান আছে এমন বাবা-মায়েরা, টিএলসি/সিএফএস কেন্দ্রগুলো বন্ধ থাকার কারণে শিশুদের পড়াশোনায় কী ধরনের প্রভাব পড়বে সেটি নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানাতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে কমিউনিটির কাছ থেকে পাওয়া মতামতগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এখানকার মানুষ চান যেন শিক্ষা কেন্দ্রগুলো পুনরায় খুলে দেওয়া হয় এবং তারা যেন তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা উপকরণগুলো পান। এছাড়া সামনের মাসগুলোতে যে এ ধরনের উদ্বেগ আরও বাড়বে মতামতের ধারাবাহিকতা বা প্রবণতা সে ইঙ্গিতও দেয়।

শিশুদের শিক্ষা অবকাঠামো বা শিক্ষা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ



সাক্ষাৎকারে অংশ নেয়া রোহিঙ্গা বাবা-মায়েরা বলেছেন, তাদের সন্তানেরা স্কুল/টিএলসিতে যা শিখেছে তা এরই মধ্যে ভুলে যাচ্ছে। এছাড়া টিএলসি এবং সিএফএস বন্ধ হওয়ার পর থেকে শিশুরা পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলা ও অন্যান্য কাজেই সময় বেশি নষ্ট করছে। কাজেই এ বিষয়গুলোটা শিশুদের বিকাশ ও তাদের ভবিষ্যতের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটি নিয়ে বাবা-মায়েরা চিন্তিত। আবার এই গবেষণার অংশ নেয়া কয়েকজন জানিয়েছেন যে, তাদের শিশুদের আচরণ বদলে গেছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে শিশুদের মনোযোগ কমে যাওয়া, বাবা-মা কিংবা বড়দের কথা না শোনা এবং কখনো কখনো তাদের অসম্মান করার বিষয়গুলোও উঠে এসেছে। শিশুরা এখন আগের চেয়ে বেশি গালি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করছে এবং যা শিখেছিল তা ভুলে যাচ্ছে।



“ স্কুল বন্ধ থাকায় আমাদের ছেলে-মেয়েরা সারাদিনই খেলাধুলা করে। এটি তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ব্যাহত করবে। ভবিষ্যতে তারা কোনো চাকরিও পাবে না। ”

– রোহিঙ্গা মা (৩০)

“ স্কুল বন্ধ থাকায় আমাদের শিশুরা যা যা শিখেছিল সব ভুলে যাচ্ছে। ”

–রোহিঙ্গা মা (৪৩)

শিশুরা খেলছে বেশি, পড়ছে কম

অংশগ্রহণকারীরা আরও বলেছেন যে, শিশুরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি খেলাধুলা করছে। এক্ষেত্রে পাহাড়ী অঞ্চলে শিশুদের দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধুলা নিয়ে মায়েরা বেশ উদ্বিগ্ন। এছাড়া শিশুরা সিএফএসে খেলতে যেতে না পারায় আগের চেয়ে দুর্ঘটনাও বেশি ঘটছে। অন্যদিকে শিশুদের বাবারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, তাদের ছেলেরা বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের না জানিয়েই ঘন ঘন ঘরের বাইরে যাচ্ছে, আগের চেয়ে বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে এবং বাজার এলাকায় ‘খারাপ’ লোকদের সংস্পর্শে আসছে, যারা তাদের পর্নোগ্রাফির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন আরও জানিয়েছেন, ছেলেরা (১৬-১৮ বছর বয়সী) মোবাইল ফোনে পর্নোগ্রাফি দেখছে এবং এই পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তিন মাস ধরে এই সুবিধাগুলো (শিক্ষা কেন্দ্র) বন্ধ থাকায়, তাদের শিশুরা মজবে যাওয়া শুরু করছে (ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে কম বয়সীরা আরবি শিখতে পারে)। কয়েকজন বাবা বলেছেন, তাদের কমিউনিটিতে, কোভিড-১৯ এর ভয়ে সব শিশুরা মজবে যাচ্ছে না। ফলে কোভিড-১৯ এর আগের সময়ের তুলনায় শিশুদের মজবে উপস্থিতিও এখন কম। এর মধ্যে কিছু পরিবার তাদের সন্তানদের ইংরেজি ও বার্মিজ পড়ানোর জন্য শিক্ষিত রোহিঙ্গা তরুণদের প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। তবে এভাবে ব্যক্তিগত শিক্ষক নিয়োগ করার সামর্থ্য সব পরিবারের নেই।

আবার যাদের সামর্থ্য আছে তারাও জানিয়েছেন যে, সব সন্তানকে প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়ানোর সামর্থ্য যেহেতু তাদের নেই, তাই কোন সন্তানকে আগে পড়াবেন আর কাকে পড়াতে পারবেন না সেটি নিয়ে তাদের ভাবতে হচ্ছে।

“ আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন বাসায় পড়তে পারে সেজন্য তাদের প্রাইভেট শিক্ষক দরকার। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কারণে আমরা প্রাইভেট শিক্ষক রাখতে পারছি না। ”

– রোহিঙ্গা মা (৩০)

কিছু পুরুষ অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, যদিও কোভিড-১৯ পরিস্থিতি চলমান কিন্তু তারা সন্তানদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন। তাদের ছেলেরা যেহেতু ‘খারাপ মানুষের’ সাথে মিশে ‘খারাপ’ হয়ে যাচ্ছে, তাই তারা সন্তানদের নিয়মিত মজবে পাঠাচ্ছেন।

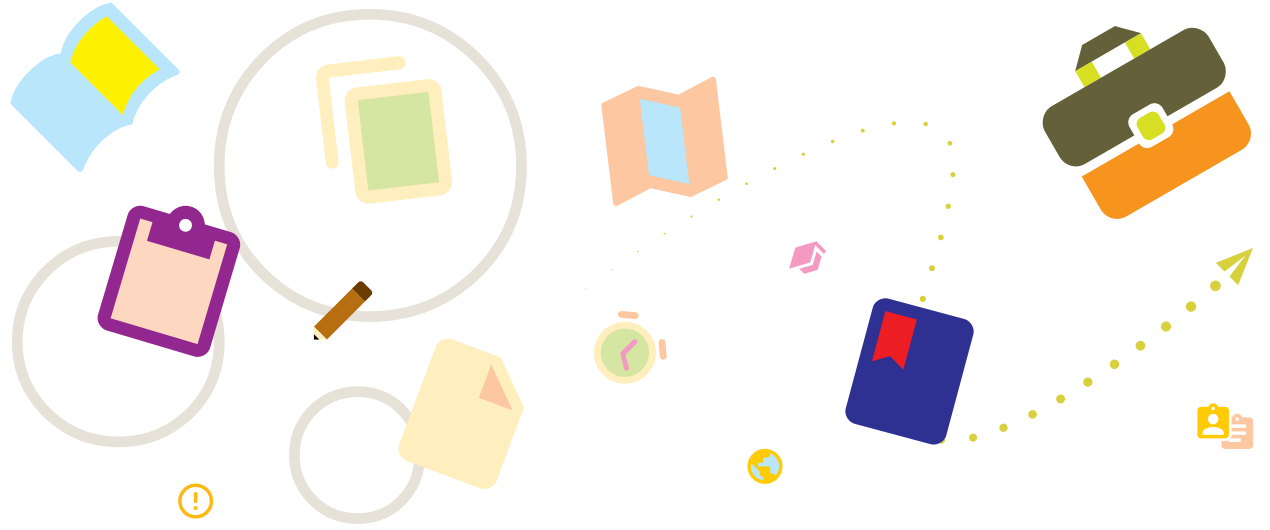
“ সিআইসি এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট থেকে আমাদের বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ এর কারণে আমরা যেনো সন্তানদের বাইরে খেলতে না দেই। যদিও কোভিড-১৯ এর আগে তারা স্কুলে খেলতে পারতো। ”

– রোহিঙ্গা বাবা (৪৪)



সিএফএস এবং টিএলসিতে যেতে না পারায় শিশুদের খারাপ লাগে এবং শিক্ষা উপকরণগুলো যোগার করতেও তাদের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া শিশুরা বলেছে, সিএফএস এবং টিএলসি পুনরায় চালু হোক এটাই তাদের আশা। সেই সাথে কোভিড-১৯ এর আগে তারা যেভাবে পড়ালেখা করতে ও খেলতে পারতো এখন সেগুলো করতে না পারায় তাদের খারাপ লাগছে। কেউ কেউ বলেছে, খেলতে যেতে না পারা, পড়াশোনা এবং বন্ধুদের সাথে দেখা করতে না পারায় তাদের মন খারাপ হচ্ছে।



“স্কুল বন্ধ থাকায় আমি স্কুলের বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারছি না। আগের মতো খেলতেও পারছি না। এজন্য আমার মন খারাপ থাকে।”

– রোহিঙ্গা বালক

“আমি আগে যেসব বিষয়ে পড়াশোনা করেছি তার কিছু কিছু আমার মনে আছে, আবার কিছু জিনিস ভুলেও গিয়েছি। এটি আমার খারাপ লাগছে।”

– রোহিঙ্গা বালক

অল্প বয়সী / তরুণ অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তাদের শিক্ষা উপকরণ, যেমন – বই, পড়ার টেবিল এবং ঘরে বসে পড়াশোনা করার মতো একটি জায়গা প্রয়োজন। এছাড়া লেখা ও আঁকার জন্য নোটবুক (আগের নোটবুকগুলো এরই মধ্যে লিখে প্রায় শেষ করে ফেলেছে), লেখা অনুশীলন করতে স্নেট, কলম, পেন্সিল এবং আঁকার জন্য রঙিন পেন্সিল দরকার। বাবা-মায়ের মতো শিশুদের দেওয়া বইগুলো (টিএলসি এবং মক্তব থেকে) ছিঁড়ে গেছে এবং খাতার পৃষ্ঠাগুলো ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গেছে। স্নেট এবং রঙিন পেন্সিল কেবল টিএলসি থেকেই সরবরাহ করা হতো। ফলে বাড়িতে এগুলো না থাকায় শিশুরা এখন এসব চাইছে। তাছাড়া আগে দেওয়া কলম ও পেন্সিলগুলো হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার কারণে তারা চায় যেন ভবিষ্যতে আরও বেশি পরিমাণে এগুলো দেওয়া হয়। কয়েক জন মা বলেছেন, শিশুদের কলম এবং পেন্সিল কেনার জন্য তাদের মাঝে মাঝে ত্রাণ সামগ্রীও বিক্রি করতে হয়। আবার কয়েক জন অল্প বয়সী/তরুণ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তারা পড়ার জন্য পবিত্র কোরআন শরীফ পেতে আগ্রহী।

“পড়াশোনা করার জন্য আমার বই, খাতা, কলম, একটি ব্যাগ এবং স্নেট দরকার, যেগুলো আমি আগে স্কুলে থাকতে ব্যবহার করেছি।”

– রোহিঙ্গা বালক

সাক্ষাৎকারে অংশ নেয়া কম বয়সী রোহিঙ্গা ছেলেরা বলেছে, ফুটবল খেলা তাদের প্রিয় হলেও যে বলগুলো দিয়ে তারা খেলতো সেগুলো এখন নষ্ট হয়ে গেছে। তারা জানিয়েছে, তাদের ফুটবল, ব্যাট-বল, ক্যারম বোর্ড ও লুডোর মতো নতুন কিছু খেলার সামগ্রী প্রয়োজন। এছাড়া খেলার জন্য তুলনামূলক ছোট জায়গা এবং খেলার সময় বয়স্ক পাড়া প্রতিবেশীদের বিরক্ত হওয়ার কথাও তারা জানিয়েছে। অন্যদিকে রোহিঙ্গা মেয়েরাও তাদের খেলার জন্য আরও কিছু সামগ্রী যেমন: খেলনা গাড়ি, রান্না করার পাত্র, দড়ি লাফানোর দড়ি এবং দোলনার মতো খেলার সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেছে।

“আমি আগেও খেলতাম, তবে সেটা ছিল স্কুলে। আর এখন আমরা যেসব খেলা খেলি তা আমার পছন্দ না।”

– রোহিঙ্গা বালিকা

“আমি খেলার জন্য খেলনা গাড়ি, খেলনা ঘোড়া, খেলনা রান্নার পাত্র এবং একটি দোলনা চাই।”

–রোহিঙ্গা বালিকা

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া একজন মা বলেছেন, ছেলেমেয়েরা ঘরের বাইরে খেললে কোভিড-১৯ হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন এবং এমনটা হলে অন্যরা তাদের গালমন্দ করতে পারে। কাজেই শিশুদের যদি ঘরে বসে খেলার মতো কিছু খেলনা দেওয়া হয় তাহলে সেটি খুব ভালো হবে বলে তিনি মনে করেন।

মোটামুটিভাবে রোহিঙ্গা বাবা-মায়েরা এটাই চান যে, তাদের সন্তানের শিক্ষা ও সামাজিক মেলামেশার নিরাপদ স্থান হিসেবে টিএলসি এবং সিএফএসগুলো আবারও খুলে দেওয়া হোক। এছাড়া এই সুবিধা বা সেবাগুলো কবে খুলবে সেটিও তারা জানতে চান।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কয়েকজন, মাঝি (রোহিঙ্গা নেতা হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি) এবং শিক্ষকদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। তবে এই সুবিধাগুলো আবার কবে চালু হবে সে বিষয়ে এদের কেউই সেভাবে কিছু জানাতে পারেনি। যদিও কিছু অংশগ্রহণকারীর বলেছেন, কোভিড-১৯ মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিএলসি এবং সিএফএসগুলো খুলবে না বলেই তাদের ধারণা।

“এনজিওগুলো যদি আমাদের শিশুদের জন্য শিক্ষা এবং ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করতো তাহলে খুব ভালো হতো।”

– রোহিঙ্গা বাবা (বয়স ৩২)

এনজিওগুলো যেন একেকটি ক্যাম্পের শিশুদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাদের জন্য প্রাইভেট শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেয় সেই পরামর্শও কিছু অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে এসেছে।

কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে টিকাদান সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের দৃষ্টিভঙ্গি

কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে কোনও টিকা এলে রোহিঙ্গারা সম্ভবত সেটা নিতে রাজি হবে, যদি তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখা হয়। বিশেষত কক্সবাজারের ক্যাম্পে অত্যধিক ঘনবসতির কারণে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি খুব বেশি। যখন টিকা আসবে তখন তা কীভাবে বিতরণ করা হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে কক্সবাজারের স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে। তবে সম্প্রদায় সমর্থন না করলে এবং কর্মসূচীর পরিকল্পনায় সম্মত না হলে, কোনও টিকাদান কর্মসূচী সফল হতে পারে না। সেইজন্য টিডব্লিউবি সম্ভাব্য টিকা সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য ক্যাম্পের থেকে ১৮ জন রোহিঙ্গার সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

রোহিঙ্গারা টিকা নিতে চান তবে তাদের আরও তথ্য প্রয়োজন

যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের সকলেই মনে করেন যে নিজেদের এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে টিকা নেয়া জরুরি। অনেকে আরও বলেছেন যে, ভাইরাসের কারণে ক্যাম্পের বাসিন্দাদের ভেতরে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, টিকা সেটাও দূর করবে। তবে এদের মধ্যে মাত্র তিনজনই বলেছেন যে কোভিড-১৯ এর টিকা সম্পর্কে তারা কোনও তথ্য পেয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জনের বিশ্বাস যে, টিকা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করা হয়েছে এবং তৃতীয়জন বলেছেন যে, এখনও পর্যন্ত কোনও টিকা আবিষ্কার হয়নি।

“আমি কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি আর সংবাদেও পড়েছি যে করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার করা হয়েছে।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (৩৩-৩৬)

“আমি শুনেছি যে, বাংলাদেশী ডাক্তাররা করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার করেছেন।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (৩০-৩৩)

“আমি করোনাভাইরাসের টিকা সম্পর্কে কোনও তথ্য পাইনি।”

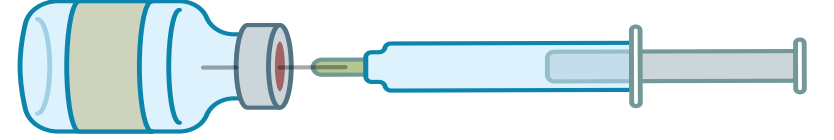
- রোহিঙ্গা নারী (৬০-৬৩)

মুখে খাওয়ার টিকাই সবচেয়ে ভালো, বিশেষত শিশুদের জন্য

সাক্ষাৎকারে নয় জন মুখে খাওয়ার টিকা বেশি পছন্দ বলে জানিয়েছেন। ইনজেকশন নিয়ে উদ্বেগই এই পছন্দের মূল কারণ। বিশেষত শিশুদের জন্য মুখে খাওয়ার টিকাই বেশিরভাগের পছন্দ এবং একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেছেন যে কখনো কখনো ইনজেকশন দিলে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাক্ষাৎকারে একজন বলেছেন যে, তিনি কেবল মুখে খাওয়ার টিকাই নেবেন কারণ তিনি ইঞ্জেকশনে ভয় পান। আরেকজন জানিয়েছেন যে তার মুখে খাওয়ার টিকাই পছন্দ, কারণ আগে তার সন্তানকে ইনজেকশন দেয়ার পরে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। অন্যান্যরা ইনজেকশনের কারণে ব্যথার কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে একজন জানিয়েছেন যে, সম্প্রদায়ের মানুষ ইনজেকশন নিতে ভয় পাচ্ছে কারণ তাদের বিশ্বাস হাসপাতালে প্রায়শই লোকে ইনজেকশন দেওয়ার পরে মারা যায়।

এদের মধ্যে পাঁচজন বলেছেন যে তারা ইনজেকশনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর টিকা নিতে চান। তাদের মতে, সুইজের মাধ্যমে টিকা দিলে সেটা সত্যিই শরীরের মধ্যে গেছে বলে মনে হয়, এবং আরও দ্রুত কাজ করে।

সূত্র: ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য, বিশেষত কোভিড-১৯ সম্পর্কে তারা কোন তথ্যগুলি জানতে চাইছেন তা জানার জন্য ট্রান্সলেটস উইদাউট বার্ডার্স (টিডব্লিউবি) ক্যাম্পের নয় জন রোহিঙ্গা পুরুষ এবং নয় জন রোহিঙ্গা নারীর ফোনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এই সাক্ষাৎকার ২০২০ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি নেয়া হয়েছিল।



তাছাড়া এই উদ্বেগও রয়েছে যে কিছু মানুষ, বিশেষত শিশুরা খারাপ স্বাদের কারণে টিকা মুখ থেকে ফেলে দিতে পারে। বাকি চারজন সাক্ষাৎকারদাতা টিকা দেয়ার উভয় পদ্ধতিতেই রাজি আছেন। দুজন সাক্ষাৎকারদাতার টিকা নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। যেমন একজন গুজব শুনেছেন যে টিকা নিলে শরীরে সাপ, কেনো বা বিছের উল্কি দেখা দেবে।

“আমার শিশুদের ইঞ্জেকশন দিতে ভয় পাচ্ছি। আর আমি নিজেও মুখে খাওয়ার ওষুধই পছন্দ করি।”

- রোহিঙ্গা নারী (৩০-৩৩)

“আমার সম্প্রদায়ের মানুষজন ইনজেকশন নিতে ভয় পায় কারণ আগে অনেকেই হাসপাতালে ইনজেকশন নিয়ে মারা গেছে।”

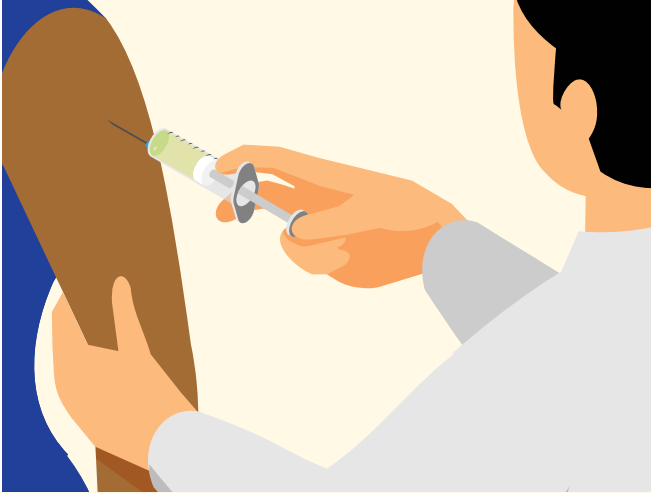
- রোহিঙ্গা নারী (২৭-২৯)

“যখন বাংলাদেশে প্রথম এসেছিলাম তখন গুজব শুনেছিলাম যে, আমরা টিকা নিলে আমাদের শরীরে সাপ, কেনো বা বিছের উল্কি ফুটে উঠবে।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (২৭-২৯)

মানুষ টিকার ওপর আস্থা রাখবে, বিশেষত যদি বিশ্বস্ত কেউ টিকা দেয়

সাক্ষাৎকারদাতাদের সকলেই বিশ্বাস করেন যে ক্যাম্পে টিকা দেয়া হলে তা নিরাপদ হবে এবং সেটা আগে থেকে পরীক্ষা করা হবে। ১৮ জন সাক্ষাৎকারদাতার সকলেই বলেছেন ক্যাম্পে বিনামূল্যে টিকা দেয়া হলে তারা নিজেরা এবং পরিবারের শিশুদের সেটা দেবেন। ১৮ জনের মধ্যে ১৬ জন বলেছেন যে তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে যে ক্যাম্পে শুধুমাত্র অনুমোদিত টিকাই দেয়া হবে। একজন বলেছেন যে রোহিঙ্গার খ্রিস্টানদের বানানো টিকাকে বিশ্বাস করবে না এবং মুসলমানদের বানানো টিকার ওপর বেশি আস্থা রাখবে।



“অন্যেরা না নিলেও (টিকা) আমি আমার পরিবারের সকলকে টিকা দেব।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (৬৬-৬৯)

“আমি নিজে টিকা নেয়ার চেষ্টা করব আর আমার সন্তানদেরও দেয়ার চেষ্টা করবো, কারণ ক্যাম্পে চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা নেই। তাই টিকা নিলে আমরা এই মারাত্মক রোগের থেকে নিরাপদ থাকব।”

- রোহিঙ্গা নারী (৪০-৪৩)

“আমাদের সম্প্রদায় খ্রিস্টানদের তৈরি টিকায় বিশ্বাস করবে না, আমরা মুসলমানদের তৈরি টিকার ওপর বেশি ভরসা করবো।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (৩৭-৩৯)

বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারদাতাই বলেছেন যে বিভিন্ন এনজিও এবং কর্তৃপক্ষ টিকা সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানালে তারা সেটার ওপর ভরসা করবেন। এছাড়াও কিছুজন বলেছেন যে এনজিও বা সিআইসি স্বেচ্ছাসেবীরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকা দিলে, মানুষের বিশ্বাস বাড়বে। আবার কেউ-কেউ পরামর্শ দিয়েছেন যে টিকা নিরাপদ তা দেখানোর জন্য স্বাস্থ্যকর্মী, সিআইসি স্বেচ্ছাসেবক এবং মাঝিরা (রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্য যাদের নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে) প্রথমে টিকা নিলে মানুষ নিশ্চিত হবে।

“টিকা আবিষ্কারের পরে যদি এনজিও’রা ক্যাম্পে গিয়ে টিকার উপকারিতা সম্পর্কে আমাদের জানায় তাহলে টিকার ওপর আমার আস্থা আরও বাড়বে।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (বয়স ৫০-৫৩)

“যদি এনজিও-র স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের টিকা দিতে আসে তবে আমি নির্দিষ্টায় টিকা নেবো।”

- রোহিঙ্গা নারী (৬০-৬৩)

“স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি টিকা আর তার উপকারিতার ব্যাপারে আমাদের জানায়, এবং তারা যদি আগে থেকে কখন টিকা নিতে হবে জানায়, তবে আমি টিকার প্রতি আস্থা রাখবো।”

- রোহিঙ্গা পুরুষ (৫০-৫৩)

রোহিঙ্গাদের টিকাদান কর্মসূচীর প্রতি জোরদার সমর্থন রয়েছে। তবে, টিকা এবং তার নিরাপত্তা সম্পর্কে মানুষকে জানাতে এবং আশ্বস্ত করতে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এবং সব তথ্য এমন ভাষা এবং ফর্ম্যাটে দিতে হবে যা মানুষ বুঝতে পারে এবং তার পাশাপাশি সেই তথ্য এমন মানুষের মাধ্যমে দিতে হবে যাদের তারা আস্থা করেন।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।